চিরায়ত বই

২৭

পথের দাবী

পথের দাবী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

KOBI PROKASHANI

পথের দাবী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকাল

কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৪

প্রকাশক

সজল আহমেদ

কবি প্রকাশনী

৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট

২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সব্যসাচী হাজরা

নান্দীমুখ

শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস

৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক

অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৫০০ টাকা

Pather Dabi A novel by Sarat Chandra Chattopadhyay Published by
Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: June 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 500 Taka RS: 500 US$ 25
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98111-4-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

প্রসঙ্গ-কথা

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আগস্ট (ভাদ্র ১৩৩৩) তারিখে এই বই প্রথম প্রকাশিত হয়। বইয়ের প্রকাশক ছিলেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মুদ্রাকর ছিলেন কটন প্রেসের সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বইটি প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পর তৎকালীন ইংরাজ সরকার বইটিকে রাজদ্রোহমূলক বিবেচনা করে বাজেয়াপ্ত করে। সরকার লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরকে কিছু না বলে শুধু বইটিরই প্রচার বন্ধ করে দেয়।

পথের দাবী রাজরোষমুক্ত হয় শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। ঐ বছরেই এই বইয়ের ২য় সংস্করণও প্রকাশিত হয়।

পথের দাবী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে ১৩২৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, মাঘ, ১৩৩২ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্তিক-ফাল্গুন ও ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র এক সময় এক খণ্ড *পথের দাবী* নিয়ে তাতে কিছু কিছু সংশোধন করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক দিন পরে তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী সেই বইটি উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দেন। আমরা সেই বইটি দেখেছি এবং সেই সংশোধিত বই অনুযায়ী এর পাঠ মুদ্রিত হয়েছে।

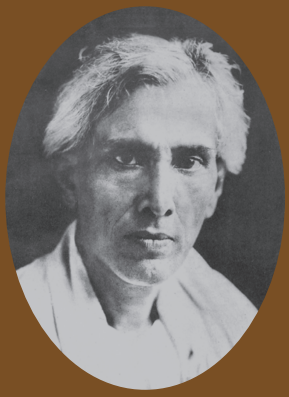

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ সালে হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্ম। তাঁর বাল্য-কৈশোর কাটে ভাগলপুরে। শরৎচন্দ্র এফ.এ. পরীক্ষা দিতে পারেননি। তাঁর বিধিমত লেখাপড়া এখানেই শেষ। ভারতবর্ষের নানাস্থানে তিনি ঘুরেছেন, ভাগ্যান্বেষণে তিনি ব্রহ্মদেশে যান এবং বারো-তেরো বৎসর রেঙ্গুনে কেরানিগিরি করেন।

১৩১৪ বঙ্গাব্দে—বৈশাখ আষাঢ় সংখ্যার ভারতীতে 'বড়দিদি' নামক গল্প প্রকাশিত হবার পর তিনি রসিক জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পাঠক সমাজে সুপরিচিত হন।

শরৎচন্দ্র মূলত ঔপন্যাসিক, যদিও কয়েকটি ছোটগল্প এবং বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ *বড়দিদি* (১৯১৩)। অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে *বিরাজ বৌ* (১৯১৪), *বিন্দুর ছেলে* (১৯১৪), *পরিণীতা* (১৯১৪), *পণ্ডিতমশাই* (১৯১৪), *মেজদিদি* (১৯১৫), *পল্লীসমাজ* (১৯১৬), *শ্রীকান্ত* (১ম খণ্ড ১৯১৭, ২য় খণ্ড ১৯১৮, ৩য় খণ্ড ১৯২৭, ৪র্থ খণ্ড ১৯৩৩), *দেবদাস* (১৯১৭), *চরিত্রহীন* (১৯১৭), *গৃহদাহ* (১৯২০), *পথের দাবী*, *শেষপ্রশ্ন* (১৯৩১) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থই অসামান্য জনপ্রিয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে তিনি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখক।

১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এক

অপূর্বর সঙ্গে তাহার বন্ধুদের নিম্নলিখিত প্রথায় প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক হইত।

বন্ধুরা কহিতেন, অপূ, তোমার দাদারা প্রায় কিছুই মানেন না, আর তুমি মানো না শোনো না সংসারে এমন ব্যাপারই নেই।

অপূর্ব কহিত, আছে বৈ কি। এই যেমন দাদাদের দৃষ্টান্ত মানিনে এবং তোমাদের পরামর্শ শুনিনে।

বন্ধুরা পুরানো রসিকতার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেন, তুমি কলেজে পড়িয়া এম. এস্‌সি. পাস করিলে, কিন্তু তবু এখনও টিকি রাখিতেছ। তোমার টিকির মিডিয়ম দিয়া মগজে বিদ্যুৎ চলাচল হয় নাকি?

অপূর্ব জবাব দিত, এম. এস্‌সি.-র পাঠ্যপুস্তকে টিকির বিরুদ্ধে কোথাও কোন আন্দোলন নেই। সুতরাং টিকি রাখা অন্যায় এ ধারণা জন্মাতে পারেনি। আর বিদ্যুৎ চলাচলের সমস্ত ইতিহাসটা আজিও আবিষ্কৃত হয়নি। বিশ্বাস না হয়, বিদ্যুৎ-বিদ্যা অধ্যাপকদের বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।

তাঁহারা বিরক্ত হইয়া কহিতেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

অপূর্ব হাসিয়া বলিত, তোমাদের এই কথাটি অভ্রান্ত সত্য, কিন্তু তবু তো তোমাদের চৈতন্য হয় না।

আসল কথা, অপূর্বর ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট পিতার বাক্যে ও ব্যবহারে উৎসাহ পাইয়া তাহার বড় ও মেজদাদারা যখন প্রকাশ্যেই মুরগি ও হোটেলের রুটি খাইতে লাগিল, এবং স্নানের পূর্বে গলার পৈতাটাকে পেরেকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া প্রায়ই ভুলিয়া যাইতে লাগিল, এমন কি ধোপার বাড়ি দিয়া কাচাইয়া ইস্ত্রি করিয়া আনিলে সুবিধা হয় কিনা আলোচনা করিয়া হাসি-তামাশা করিতে লাগিল, তখনও অপূর্বর নিজের পৈতা হয় নাই। কিন্তু ছোট হইলেও সে মায়ের গভীর বেদনা ও নিঃশব্দ অশ্রুপাত বহুদিন লক্ষ করিয়াছিল। মা কিছুই বলিতেন না। একে ত বলিলেও ছেলেরা শুনিত না, অধিকন্তু স্বামীর সহিত নিরর্থক কলহ হইয়া যাইত। তিনি শ্বশুরকুলের পৌরোহিত্য ব্যবসাকে নিষ্ঠুর ইঙ্গিত করিয়া কহিতেন, ছেলেরা যদি তাদের মামাদের মত না হয়ে বাপের মতই হয়ে উঠে ত কি করা যাবে! মাথায় টিকির বদলে টুপি পরে বলেই যে মাথাটা কেটে নেওয়া উচিত আমার তা মনে হয় না।

সেই অবধি করুণাময়ী ছেলেদের সম্বন্ধে একেবারে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন, কেবল নিজের আচার-বিচার নিজেই নীরবে ও অনাড়ম্বরে পালন করিয়া চলিতেন। তাহার পরে স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা হইয়া তিনি গৃহে বাস করিয়াও একপ্রকার গৃহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছিলেন। উপরের যে ঘরটায় তিনি থাকিতেন, তাহারই পার্শ্বের বারান্দায় খানিকটা ঘিরিয়া লইয়া তাঁহার ভাঁড়ার ও স্বহস্তে রান্নার কাজ চলিত। বধূদের হাতেও তিনি খাইতে চাহিতেন না। এমনিভাবেই দিন চলিতেছিল।

এদিকে অপূর্ব মাথায় টিকি রাখিয়াছিল, কলেজে জলপানি ও মেডেল লইয়া যেমন সে পাসও করিত, ঘরে একাদশী-পূর্ণিমা-সন্ধ্যাহ্নিকও তেমনি বাদ দিত না। মাঠে ফুটবল-ক্রিকেট-হকি খেলাতেও তাহার যত উৎসাহ ছিল, সকালে মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইতেও তাহার কোনদিন সময়াভাব ঘটিত না। বাড়াবাড়ি ভাবিয়া বধূরা মাঝে মাঝে তামাশা করিয়া বলিত, ঠাকুরপো, পড়াশুনা তো সাঙ্গ হল, এবার ডোর-কোপ্‌নি নিয়ে একটা রীতিমত গোঁসাই-টোঁসাই হয়ে পড়। এযে দেখচি বামুনের বিধবাকেও ছাড়িয়ে গেলে।

অপূর্ব সহাস্যে জবাব দিত, ছাড়িয়ে যেতে কি আর সাধে হয় বৌদি? মায়ের একটা মেয়ে-টেয়েও নেই, বয়স হয়েছে, হঠাৎ অসমর্থ হয়ে পড়লে একমুঠো হবিষ্যি রেঁধেও ত দিতে পারবো? আর ডোর-কোপ্‌নি যাবে কোথা? তোমাদের সংসারে যখন আছি, তখন একদিন তা সম্বল করতেই হবে।

বড়বধূ মুখখানি ম্লান করিয়া কহিত, কি করবো ঠাকুরপো, সে আমাদের কপাল!

তা বটে! বলিয়া অপূর্ব চলিয়া যাইত, কিন্তু মাকে গিয়া কহিত, মা, এ তোমার বড় অন্যায়। দাদারা যাই কেননা করুন, বৌদিরা কিছু আর মুরগিও খান না, হোটেলেও ডিনার করেন না, চিরকালটা কি তুমি রেঁধেই খাবে?

মা কহিতেন, একবেলা একমুঠো চাল ফুটিয়ে নিতে ত আমার কোন কষ্টই হয় না বাবা। আর নিতান্তই যখন অপারগ হব, ততদিনে তোর বৌও ঘরে এসে পড়বে।

অপূর্ব বলিত, তাই কেন না একটা বামুন-পণ্ডিতের ঘর থেকে আনিয়ে নাও না মা? খেতে দেবার সামর্থ্য আমার নেই, কিন্তু তোমার কষ্ট দেখলে মনে হয় দাদাদের গলগ্রহ হয়েই না হয় থাকবো।

মা মাতৃগর্বে দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া কহিতেন, অমন কথা তুই মুখেও আনিস নে অপূ! তোর সামর্থ্য নেই একটা বৌকে খেতে দেবার? তুই ইচ্ছে করলে যে বাড়ির সবাইকে বসে খাওয়াতে পারিস।

তোমার যেমন কথা মা। তুমি মনে কর ভূ-ভারতে তোমার মত এমন ছেলে আর কারও নেই। এই বলিয়া সে উদ্গত অশ্রু গোপন করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িত।

কিন্তু নিজের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে অপূর্ব যাহাই বলুক, তাই বলিয়া কন্যাভার-গ্রস্তের দল নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা দলে দলে আসিয়া বিনোদবাবুকে স্থানে-অস্থানে আক্রমণ করিয়া জীবন তাঁহার দুর্ভর করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিনোদ আসিয়া মাকে ধরিতেন, মা, কোথায় কোন্ নিষ্ঠে-কিষ্ঠে জপ-তপের মেয়ে আছে তোমার ছেলের বিয়ে দিয়ে চুকিয়ে ফেল, না হয় আমাকে দেখছি বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়। বাপের বড় ছেলে,—বাইরে থেকে লোকে ভাবে আমিই বুঝি বা বাড়ির কর্তা।

ছেলের কঠিন বাক্যে করুণাময়ী মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেন, কিন্তু এইখানে তিনি আপনাকে কিছুতেই বিচলিত হইতে দিতেন না। মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিতেন, লোকে তো মিথ্যে ভাবে না বাবা, তাঁর অবর্তমানে তুমিই বাড়ির কর্তা, কিন্তু অপূর সম্বন্ধে তুমি কাউকে কোন কথা দিয়ো না। আমি রূপ চাইনে, টাকাকড়ি চাইনে,—না বিনু, সে আমি আপনি দেখেশুনে তবে দেব।

বেশ ত মা, তাই দিয়ো। কিন্তু যা করবে দয়া করে একটু শীঘ্র করে কর। রাঙ্গা মাকালফল সামনে ঝুলিয়ে রেখে লোকগুলোকে আর দগ্ধে মেরো না। এই বলিয়া বিনোদ রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন।

করুণাময়ীর মনে মনে একটা সংকল্প ছিল। স্নানের ঘাটে ভারী একটি সুলক্ষণা মেয়ে কিছুদিন হইতে তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল। মেয়েটি মায়ের সহিত প্রায়ই গঙ্গাস্নানে আসিত। ইঁহারা যে তাঁহাদের স্ব-ঘর এ সংবাদ তিনি গোপনে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। স্নানান্তে মেয়েটি শিবপূজা করিত, কোথাও কিছু ভুল হয় কি না, করুণাময়ী অলক্ষ্যে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন। তাঁহার আরও কিছু কিছু জানিবার ছিল, এবং সে-পক্ষে তিনি নিশ্চেষ্টও ছিলেন না। তাঁহার বাসনা ছিল সমস্ত তথ্য যদি অনুকূল হয় ত আগামী বৈশাখেই ছেলের বিবাহ দিবেন।

এমন সময় অপূর্ব আসিয়া অকস্মাৎ সংবাদ দিল, মা, আমি বেশ একটি চাকরি পেয়ে গেছি।

মা খুশী হইয়া কহিলেন, বলিস কি রে? এই ত সেদিন পাস করলি, এরই মধ্যে তোকে চাকরি দিলে কে?

অপূর্ব হাসিমুখে কহিল, যার গরজ। এই বলিয়া সে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, তাহাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবই ইহা যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। বোথা কোম্পানি বর্মার রেঙ্গুন শহরে একটা নূতন আফিস খুলিয়াছে, তাহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র কোন বাঙালী যুবককে সমস্ত কর্তৃত্ব-ভার দিয়া পাঠাইতে চায়। বাসাভাড়া ছাড়া মাহিনা আপাতত চারি শত টাকা, এবং চেষ্টা করিয়াও কোম্পানিকে যদি লালবাতি জ্বালাইতে না পারা যায় ত ছয় মাস পরে আরও দুই শত। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কিন্তু, বর্মা-মুল্লুকের নাম শুনিয়া মায়ের মুখ মলিন হইয়া গেল, তিনি নিরুৎসুককণ্ঠে কহিলেন, তুই কি ক্ষেপেছিস অপূ, সে-দেশে কি মানুষে যায়! যেখানে জাত, জন্ম, আচার-বিচার কিছু নেই শুনেচি, সেখানে তোকে দেব আমি পাঠিয়ে? এমন টাকায় আমার কাজ নেই।

জননীর বিরুদ্ধতায় অপূর্ব ভীত হইয়া কহিল, তোমার কাজ নেই, কিন্তু আমার ত আছে মা। তবে, তোমার হুকুমে আমি ভিখিরী হয়েও থাকতে পারি, কিন্তু সারা জীবনে কি এমন সুযোগ আর জুটবে? তোমার ছেলের মত বিদ্যে-বুদ্ধি আজকাল শহরের ঘরে ঘরে আছে, এতএব, বোথা কোম্পানির আটকাবে না, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল সাহেব যে আমার হয়ে একেবারে কথা দিয়ে দিয়েছেন, তাঁর লজ্জার অবধি থাকবে না। তা ছাড়া বাড়ির সত্যকার অবস্থাও ত তোমার অজানা নয় মা?

মা বলিলেন, কিন্তু সেটা যে শুনেচি একেবারে ম্লেচ্ছ দেশ।

অপূর্ব কহিল, কে তোমাকে বাড়িয়ে বলেচে। কিন্তু এটা ত তোমার ম্লেচ্ছ দেশ নয়, অথচ যারা হতে চায় তাদের ত বাধে না মা।

মা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু এই বৈশাখে যে তোর বিয়ে দেব আমি স্থির করেচি।

অপূর্ব কহিল, একেবারে স্থির করে বসে আছ মা? বেশ ত, দু-এক মাস পেছিয়ে দিয়ে যেদিন তুমি ডেকে পাঠাবে সেই দিনই ফিরে এসে তোমার আজ্ঞা পালন করবো।

করুণাময়ী বাহিরের চক্ষে সেকেলে হইলেও অতিশয় বুদ্ধিমতী। তিনি অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, যখন যেতেই হবে তখন আর উপায় কি। কিন্তু তোমার দাদাদের মত নিয়ো।

এই বর্মা-যাত্রা সম্পর্কে তাঁহার আর দুটি সন্তানের উল্লেখ করিতে করুণাময়ীর অতীত ও বর্তমানের সমস্ত প্রচ্ছন্ন বেদনা যেন এককালে আলোড়িত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে দুঃখ আর তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না। তাঁহার পিতৃকুল গোকুল-দীঘির সুবিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, এবং বংশপরম্পরায় তাঁহারা অতিশয় আচারপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান হিন্দু। শিশুকাল হইতে যে সংস্কার তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল উত্তরকালে তাহা স্বামী ও পুত্রদের হস্তে যতদূর আহত ও লাঞ্ছিত হইবার হইয়াছে, কেবল এই অপূর্বকে লইয়াই তিনি কোনমতে সহ্য করিয়া আজও গৃহে বাস করতেছিলেন, সে ছেলেও আজ তাঁহার চোখের আড়ালে কোন্ অজানা দেশে চলিয়াছে। এ কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার ভয় ও ভাবনার সীমা রহিল না, শুধু মুখে বলিলেন, যে ক'টা দিন বেঁচে আছি অপূ, তুই কিন্তু আর আমাকে দুঃখ দিসনে বাবা। এই বলিয়া তিনি আঁচল দিয়া চোখ-দুটি মুছিয়া ফেলিলেন।

অপূর্বর নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল, সে প্রত্যুত্তরে কেবল কহিল, মা, আজ তুমি ইহলোকে আছ, কিন্তু একদিন তোমার স্বর্গবাসের ডাক এসে

পৌঁছবে, সেদিন তোমার অপূকে ফেলে যেতে হবে জানি, কিন্তু, একটা দিনের জন্যেও যদি তোমাকে চিনতে পেরে থাকি মা, তাহলে সেখানে বসেও কখনো এ ছেলের জন্যে তোমাকে চোখের জল ফেলতে হবে না। এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে অন্যত্র প্রস্থান করিল।

সেদিন সন্ধ্যাকালে করুণাময়ী তাঁহার নিয়মিত আহ্নিক ও মালায় মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না, উদ্বেগ ও বেদনার ভারে তাঁহার দুই চক্ষু পুনঃ পুনঃ অশ্রু-আবিল হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং কি করিলে যে কি হয় তাহা কোন মতেই ভাবিয়া না পাইয়া অবশেষে তাঁহার বড় ছেলের ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইলেন। বিনোদকুমার কাছারি হইতে ফিরিয়া জলযোগান্তে এইবার সান্ধ্য-পোশাকে ক্লাবের উদ্দেশে যাত্রা করিতেছিলেন, হঠাৎ মাকে দেখিয়া একেবারে চমকিয়া গেলেন। বস্তুত, এ ঘটনা এমনি অপ্রত্যাশিত যে সহসা তাঁহার মুখে কথা যোগাইল না।

করুণাময়ী কহিলেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি বিনু।

কি মা?

মা তাঁহার চোখের জল এখানে আসিবার পূর্বে ভাল করিয়া মুছিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর্দ্রকণ্ঠ গোপন রহিল না। তিনি আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া শেষে অপূর্বর মাসিক বেতনের পরিমাণ উল্লেখ করিয়াও যখন নিরানন্দ-মুখে কহিলেন, তাই ভাবছি বাবা, এই ক'টা টাকার লোভে তাকে সেখানে পাঠাব কি না, তখন বিনোদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। সে রুক্ষস্বরে কহিল, মা, তোমার অপূর্বর মত ছেলে ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নেই সে আমরা সবাই মানি, কিন্তু পৃথিবীতে বাস করে এ কথাটাও ত না মেনে পারিনে যে, প্রথমে চার শ এবং ছ মাসে ছ শ টাকা সে ছেলের চেয়েও অনেক বড়।

মা ক্ষুণ্ন হইয়া কহিলেন, কিন্তু, সে যে শুনেছি একেবারে ম্লেচ্ছ দেশ।

বিনোদ কহিল, মা, জগতে তোমার শোনা এবং জানাটাই কেবল অভ্রান্ত না হতে পারে।

ছেলের শেষ কথায় মা অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিয়া কহিলেন, বাবা বিনু, এই একই কথা তোমাদের জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত শুনে শুনেও যখন আমার চৈতন্য হল না, তখন শেষ দশায় আর ও-শিক্ষা দিয়ো না। অপূর্বর দাম কত টাকা সে আমি জানতে আসিনি, আমি শুধু জানতে এসেছিলাম অতদূরে তাকে পাঠানো উচিত কি না।

বিনোদ হেঁট হইয়া ডান হাতে তাড়াতাড়ি মায়ের দুই পা স্পর্শ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা, তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য একথা আমি বলিনি। বাবার সঙ্গেই আমাদের মিলত সে সত্যি, এবং টাকা জিনিসটা যে

সংসারে দামী ও দরকারী এ তাঁর কাছেই শেখা। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে সে লোভ তোমাকে আমি দেখাচ্চি নে। তোমার ম্লেচ্ছ বিনুর এই হ্যাট-কোটের ভেতরটা হয়ত আজও ততবড় সাহেব হয়ে উঠেনি যে, ছোটভাইকে খেতে দেবার ভয়ে স্থান-অস্থানের বিচার করে না। কিন্তু তবুও বলি, ও যাক। দেশে আবহাওয়া যা বইতে শুরু করেছে মা, তাতে ও যদি দিন-কতক দেশ ছেড়ে কোথাও গিয়ে কাজে লেগে যেতে পারে ত ওর নিজেরও ভাল হবে, আমরাও সগোষ্ঠী হয়ত বেঁচে যাবো! তুমি তো জানো মা, সেই স্বদেশী আমলে ওর গলা টিপলে দুধ বেরোত, তবু তারই বিক্রমে বাবার চাকরি যাবার জো হয়েছিল।

করুণাময়ী শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, না না, সে-সব অপূ আর করে না। সাত-আট বছর আগে তার কি বা বয়স ছিল, কেবল দলে মিশেই যা—

বিনোদ মাথা নাড়িয়া একটু হাসিয়া কহিল, হয়ত, তোমার কথাই ঠিক, অপূর্ব এখন আর কিছু করে না, কিন্তু সকল দেশেই জন-কতক লোক থাকে মা, যাদের জাতই আলাদা,—তোমার ছোট ছেলেটি সেই জাতের। দেশের মাটি এদের গায়ের মাংস, দেশের জল এদের শিরার রক্ত; শুধু কি কেবল দেশের হাওয়া-আলো,—এর পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, চন্দ্র-সূর্য, নদী-নালা যেখানে যা কিছু আছে সব যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে এরা শুষে নিতে চায়! বোধ হয় এদেরই কেউ কোন্ সত্যকালে জননী-জন্মভূমি কথাটা প্রথম আবিষ্কার করেছিল। দেশের সম্পর্কে এদের কখনো বিশ্বাস করো না মা, ঠকবে। এদের বেঁচে থাকা আর প্রাণ দেওয়ার মধ্যে এই এতটুকুমাত্র প্রভেদ! এই বলিয়া সে তাহার তর্জনীর প্রান্তভাগটুকু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেখাইয়া কহিল, বরঞ্চ তোমার এই ম্লেচ্ছাচারী বিনুটিকে তোমার ওই টিকিধারী গীতা-পড়া এম. এস্‌সি. পাস করা অপূর্বকুমারের চেয়ে ঢের বেশী আপনার বলে জেনো।

ছেলের কথাগুলো মা ঠিক যে বিশ্বাস করিলেন তাহা নয়, কিন্তু এক সময়ে নাকি এই লইয়া তাঁহাকে অনেক উদ্বেগ ভোগ করিতে হইয়াছে তাই মনে মনে চিন্তিত হইলেন। দেশের পশ্চিম দিগন্তে যে একটা মেঘের লক্ষণ দেখা দিয়াছে এ সংবাদ তিনি জানিতেন। তাঁহার প্রথমেই মনে হইল তখন অপূর্বর পিতা জীবিত ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি পরলোকগত।

বিনোদ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল, কিন্তু তাহার বাহিরে যাইবার ত্বরা ছিল, কহিল, বেশ ত মা, সে ত আর কালই যাচ্চে না, সবাই একসঙ্গে বসে যা হোক একটা স্থির করা যাবে। এই বলিয়া সে একটু দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল।

দুই

জাহাজের কয়টা দিন অপূর্ব চিঁড়া চিবাইয়া সন্দেশ ও ডাবের জল খাইয়া সর্বাঙ্গীণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিয়া অর্ধমৃতবৎ কোনমতে গিয়া রেঙ্গুনের ঘাটে পৌঁছিল। নব-প্রতিষ্ঠিত বোথা কোম্পানির জন-দুই দরোয়ান ও একজন মাদ্রাজী কর্মচারী জেটিতে উপস্থিত ছিলেন, ম্যানেজারকে তাঁহারা সাদর সম্বর্ধনা করিলেন। তিনি ত্রিশ টাকা দিয়া বাসা ভাড়া করিয়া আফিসের খরচায় যথাযোগ্য আসবাবপত্রে ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছেন এ সংবাদ দিতেও বিলম্ব করিলেন না।

ফাল্গুন মাস শেষ হইতে চলিয়াছে, গরম মন্দ পড়ে নাই। সমুদ্রপথের এই প্রাণান্ত বিড়ম্বনা ভোগের পর নিরালা গৃহের সজ্জিত শয্যার উপরে হাত-পা ছড়াইয়া একটুখানি শুইতে পাইবে কল্পনা করিয়া সে যথেষ্ট তৃপ্তি অনুভব করিল। পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে আসিয়াছিল, হালদার পরিবারে বহুদিনের চাকরিতে তাহার নিখুঁত শুদ্ধাচারিতা করুণাময়ীর কাছে সপ্রমাণ হইয়া গেছে। তাই বাড়ির বহু অসুবিধা সত্ত্বেও এই বিশ্বস্ত লোকটিকে সঙ্গে দিয়া মা অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। আবার শুধু কেবল পাচকই নয়, পাক করিবার মত কিছু কিছু চাল-ডাল ঘি-তেল গুঁড়া মশলা, মায় আলু পটল পর্যন্ত সঙ্গে দিতে তিনি বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং ঈষদুষ্ণ অন্ন-ব্যঞ্জনে মুখের শুকনা চিঁড়ার স্বাদটাও যে সে অবিলম্বে ফিরাইতে পারিবে এ ভরসাও তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় চমকিয়া গেল। গাড়ি ভাড়া হইয়া আসিলে কর্মচারী বিদায় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মোটঘাট জিনিসপত্র লইয়া আফিসের দরোয়ানজী পথ দেখাইয়া সঙ্গে চলিল, এবং একটানা জলযাত্রা ছাড়িয়া শক্ত ডাঙার উপরে গাড়ির মধ্যে বসিতে পাইয়া অপূর্ব আরাম বোধ করিল। কিন্তু মিনিট-দশেকের মধ্যে গাড়ি যখন বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল, এবং দরোয়ানজী হাঁকডাকে প্রায় ডজন-খানেক কলিঙ্গ দেশীয় কুলী যোগাড় করিয়া মোটঘাট উপরে তুলিবার আয়োজন করিল, তখন, সেই তাহার ত্রিশ টাকা ভাড়ার বাটীর চেহারা দেখিয়া অপূর্ব হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। বাড়ির শ্রী নাই, ছাঁদ নাই, সদর নাই, অন্দর নাই, প্রাঙ্গণ বলিতে এই চলাচলের পথটা ছাড়া আর কোথাও কোন স্থান নাই। একটা অপ্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি রাস্তা হইতে সোজা তেতলা পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে, সেটা যেমন খাড়া তেমনি অন্ধকার। ইহা কাহারও নিজস্ব নহে, অন্ততঃ ছয়জন ভাড়াটিয়ার ইহাই চলাচলের সাধারণ পথ। এই উঠা-নামার কার্যে দৈবাৎ পা ফসকাইলে প্রথমে পাথর-বাঁধানো রাজার রাজপথ, পরে তাঁহারই হাসপাতাল, এবং তৃতীয় গতিটা না ভাবাই ভাল। এই দুরারোহ দারুময় সোপানশ্রেণীর সহিত পরিচিত হইয়া উঠিতে কিছু দীর্ঘকাল লাগে। অপূর্ব

নূতন লোক, তাই সে প্রতি পদক্ষেপে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া দরোয়ানের অনুবর্তী হইয়া উঠিতে লাগিল। দরোয়ান কতকটা উঠিয়া ডান দিকে দোতলার একটা দরজা খুলিয়া দিয়া জানাইল, সাহেব, ইহাই আপনার গৃহ।

ইহার মুখোমুখি বামদিকের রুদ্ধদ্বারটা দেখাইয়া অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, এটাতে কে থাকে?

দরোয়ান কহিল, কোই এক চীনা-সাহেব রহ্‌তেঁহে শুনা।

অপূর্ব ঠিক তাহার মাথার উপরে তেতলায় কে থাকে প্রশ্ন করায় সে কহিল, এক কালা সাহেব ত রহতেঁহে দেখা। কোই মান্দ্রাজ-বালে হোয়েঙ্গে জরুর!

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। এই একমাত্র আনাগোনার পথে উপরে এবং পার্শ্বে এই দুটি একান্ত ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর পরিচয়ে তাহার মুখ দিয়া কেবল দীর্ঘশ্বাস পড়িল। নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আরও মন খারাপ হইয়া গেল। কাঠের বেড়া-দেওয়া পাশাপাশি ছোট-বড় তিনটি কুঠরী। একটিতে কল, স্নানের ঘর, রান্নার জায়গা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় যাহা কিছু সমস্তই,—মাঝেরটি এই অন্ধকার সিঁড়ির ঘর, গৌরবে বৈঠকখানা বলা চলে, এবং সর্বশেষে রাস্তার ধারের কক্ষটি, অপক্ষোকৃত পরিষ্কার এবং আলোকিত,—এইটি শয়ন-মন্দির। আফিসের খরচায় এই ঘরটিকেই খাট, টেবিল এবং গুটিকয়েক চেয়ার দিয়া সাজানো হইয়াছে। পথের উপর ছোট একটুখানি বারান্দা আছে, সময় কাটানো অসম্ভব হইলে এখানে দাঁড়াইয়া লোক-চলাচল দেখা যায়। ঘরে হাওয়া নাই, আলো নাই, একটার মধ্যে দিয়া আর একটায় যাইতে হয়,—ইহার সমস্তই কাঠের,—দেয়াল কাঠের, মেঝে কাঠের, ছাত কাঠের, সিঁড়ি কাঠের, আগুনের কথা মনে হইলে সন্দেহ হয় এতবড় সর্বাঙ্গসুন্দর জতুগৃহ বোধ করি রাজা দুর্যোধনও তাঁর পাণ্ডবভায়াদের জন্য তৈরি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহারই অভ্যন্তরে এই সুদূর প্রবাসে ঘরবাড়ি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া, বৌদিদিদের ছাড়িয়া, মাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে স্মরণ করিয়া মুহূর্তের দুর্বলতায় তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল। সামলাইয়া লইয়া সে খানিকক্ষণ এঘর-ওঘর করিয়া একটা জিনিস দেখিয়া কিছু আশ্বস্ত হইল যে কলে তখনও জল আছে, স্নান ও রান্না দুই-ই হইতে পারে। দরোয়ান সাহস দিয়া জানাইল, অপব্যয় না করিলে এ শহরে জলের অভাব হয় না, যেহেতু প্রত্যেক দুই ঘর ভাড়াটিয়ার জন্য এ বাড়িতে একটা করিয়া বড়রকমের জলের চৌবাচ্চা উপরে আছে, তাহা হইতে দিবারাত্রিই জল সরবরাহ হয়। ভরসা পাইয়া অপূর্ব পাচককে কহিল, ঠাকুর, মা ত সমস্তই সঙ্গে দিয়েছেন, তুমি স্নান করে দুটি রাঁধবার উদ্যোগ কর, আমি ততক্ষণ দরোয়ানজীকে নিয়ে জিনিসপত্র কিছু কিছু গুছিয়ে ফেলি।